***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 132 – 141*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848*

# তারাশঙ্করের গল্পে রাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ

টুম্পা দে
Email ID : tumpadeyraiganj@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

## Keyword
Birbhum, Rarha Banga, Lower caste, Ancient superstitions, Marginalized people, Untouchability, life struggle.

## Abstract
India got Independence in 1947 Even after gaining Independence long Subjugation, upper caste lower caste rich and poor did not disappear from the society. Untouchability has not been erased. The oppression of the upper class against the lower class in Continuous. And these Lower class people have come up in various story novels after Independence. By the Lower class we mean the neglected, oppressed lower class of the Society. All most every Post Independence writer has a penchant for writing about the lower classes. Novendranath Mitra, Kamal Kumar Majumdar, Samaresh Basu, Sunil Gangopadhyay all have more or less marginalized peoples in their stories, Tarashankar Banerjee, a well known Humanitaria writer of Bengali Literature is one of them. He is basically a fiction writer of Rarha. He was born in a remote village of rarh bonga, and that's why his soul is connected with the people there, Tarashankar lived for 74 years, all these years of his life he had experienced various experiences. Itis revealed in many of his stories. In his Short Stories he has beautifully portrayed of the lower caste people of rarha banga who are passed away as untouchables. We find in his story the life Struggle of the people of various caste like Dom, kahar, Bagdi, Bauri, Santal etc. Living at the lower level of the Society Tarashankar Story revolues around marriage life, Living with ancient Superstitions and adopting strange rural habits. The Poor and helpless people of Birbhums rarha region are the characters of Tarashankar's Story and these are the ones that makes the Authors writing real and rich.

## Discussion
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করি উচ্চবর্গের জীবনকাহিনী থেকে সরাসরি নিম্নবর্গের রূঢ় বাস্তবতার মাটিতে নেমে আসার প্রবণতা, সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিপুল রদবদল সত্যিই অবিস্মরণীয়। তবে রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে আমরা সাধারণ নিচুতলার নর-নারীর সুখ-দুঃখের কথা খুঁজে পাইনি তা কিন্তু নয়, কিন্তু তার সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে নগরজীবন, মূলত সমাজের উঁচুতলার বিত্তবান মানুষের জীবন-যাপন। এরপর শরৎচন্দ্রের কাছেই প্রথম সাহিত্যের রসবদল ঘটল। তার

কাছেই প্রথম শুনলাম সাধারণ মানুষের কথা। সাহিত্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত খেটে খাওয়া হতদরিদ্র মানুষগুলির কথা।

এমনই একজন মানবদরদী শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রাঢ় অঞ্চলের প্রান্তবর্গীয় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তার প্রতিটি গল্পে খুব নিপুণভাবে এঁকেছেন। তার লেখায় ভীড় করে আসে রাঢ় বঙ্গের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। আর এই সব নাম না জানা মানুষগুলিই মূলত তাকে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে তুলেছে।

আমরা তারাশঙ্করের ছোটগল্পে সমাজের নিম্নবিত্ত অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের প্রভাব আলোচনা করার পূর্বে তার ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করবার প্রয়োজন অনুভব করছি। কারণ আমরা জানি তার ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলনই তার সাহিত্য। তারাশঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৮ সালে ২৩ শে জুলাই, বীরভূমের লাভপুর নামক এক প্রত্যন্ত গ্রামে। পিতার নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা প্রভাবতী। তিনি যদিও জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তথাপি সেই অঞ্চলে বসবাসকারী, কিংবা বীরভূমের অন্যান্য গন্ড গ্রামগুলির দুঃখি দরিদ্র মানুষগুলোর কথা বলেছেন তার প্রতিটি গল্পে। গল্পে উঠে এসেছে ডোম, বাউরি, বাগদী, হাড়ি, বেদেনী, লাঠিয়াল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন সংগ্রাম, নানা প্রাচীন কু-সংস্কারে আবদ্ধ জীবন, উচ্চশ্রেণীর প্রেষণে নিম্নশ্রেণীর অসহায়তা, রয়েছে সহজ সরল দাম্পত্যজীবন, যৌন প্রবৃত্তির মতো নানা গ্রাম্য প্রবৃত্তির টানা পোড়েন। মানুষের বিচিত্র রূপের পরিচয় পাই আমরা তাঁর গল্পে।

তারাশঙ্কর ছিলেন দেশসেবক তথা সমাজসেবক। নিজের কর্মসূত্রে কিংবা কখনো সমাজসেবার তাগিদে তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন বর্ধমান বীরভূম প্রভৃতি স্থানের নানা প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে। সাধারণ জনজীবনের সঙ্গে যাদের মিলিয়ে ফেলা যায় না, দরিদ্র অসহায়, সহায়সম্বলহীন বিভিন্ন নিম্ন পেশাদারী বিভিন্ন জাতির মানুষগুলোই তার গল্পের চরিত্র। তার গল্প পড়লে রাঢ়বঙ্গের সাধারণ মানুষগুলোর চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা কিভাবে একটি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং গ্রামবাংলার নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্ক এবং শেষমেষ প্রকৃতির কাছে সমস্ত সম্পর্কের বলি, প্রেম ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব এক অসাধারণ রূপকল্পে ফুটে উঠেছে তার 'তারিণী মাঝি' গল্পে।

মাঝি তারিণীর জীবন ময়ূরাক্ষী নদীটিকে ঘিরেই নানা বাঁক নেয়, বীরভূমের এই ময়ূরাক্ষী নদীটির সঙ্গে ছিল তারাশঙ্করের আত্মার যোগ। সে কারণেই তিনি তারিণী মাঝির মতো গল্প লিখতে পেরেছিলেন। তার মাঝি জীবন এই দুর্গম নদীকেন্দ্রিক, বান-বন্যা ছাড়া বর্ষাটা তারিণীর কাছে সংকটের নয়, বরং উপার্জনের সময়। শুধুমাত্র গ্রামবাংলার বিভিন্ন মানুষদের নদীর এপাড় থেকে ওপাড় পৌঁছে দিয়ে রোজগার করে না বরং তার বলিষ্ঠ দেহকে কাজে লাগিয়ে ময়ূরাক্ষীর জলে ডুবন্ত পশু থেকে মানুষ সকলেই উদ্ধার করে উপরন্তু পাওয়া বক্‌শিসে স্ত্রী সুখীর জন্য গয়না আনতে ভোলে না সে।

রাঢ় বাংলার রূক্ষ মাটিতে যেমন খড়ার প্রাদুর্ভাব তেমনি মাঝে মাঝে আসে বান-বন্যার মতো দূর্যোগ এছাড়া দেখা যায় দুর্ভক্ষের করাল গ্রাস গোটা গ্রামকে গ্রাস করছে—

> "দূর্ভিক্ষ যেন দেশের মাটির তলেই আত্মগোপন করিয়াছিল। মাটির ফাটলের মধ্য দিয়া পথ পাইয়া সে ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল।"[১]

এমনকি দূর্ভিক্ষের তাড়ণায় গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয় কাঁলাচাদের মতো গ্রাম্যজীবনপ্রিয় মানুষটিও। পলাশডাঙার ভদ্রলোকের গলায় দড়ি, গ্রামের প্রান্তে মৃতদেহগুলি শেয়াল শকুন ছিড়ে খাওয়া এসবের মধ্যেও দুর্ভিক্ষের হাহাকার স্পষ্ট হয়।

গ্রামীণ জীবনের সহজ স্বাভাবিক সংস্কার বিশ্বাস যে মানুষগুলোর ভিতরে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত, তা তারিণীর কথাতে ফুটে ওঠে।

> "পিঁপড়ের ডিম মুখে নিয়ে ওপড়ের পারে চলল, জল এইবার হবে।"[২]

মাঝির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে ছোট করলেন না লেখক সত্যিই বান এলো মহা দুর্যোগের মতো। যে তারিণী স্ত্রী সুখীর জন্য সমস্ত কিছু বিসর্জন দিতে পারে সেই জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ রক্ষার্থে বিপদকালে স্ত্রী সুখীর গলা পোষন করতে বাধ্য হয়েছে। অবশেষে জল ও মাটিই তার কাছে একান্ত কাম্য হয়ে উঠেছে।

'নারী ও নাগিনী' নামক আরও একটি গল্পে তারাশঙ্কর রাঢ়বঙ্গের সাধারণ বেদেনী সম্প্রদায়ের কথা অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পে পাই, খোঁড়া শেখ নামে এক সাপুরে জীবিকা নির্বাহের জন্য সাপ খেলার মতো এক দুঃসাহসিক কাজকে বেছে নিয়েছে। নারী পরুষের এক ভিন্ন প্রকার দাম্পত্য সম্পর্কের ছবি এই গল্পটি যেখানে একজন নারী অর্থাৎ খোঁড়ার স্ত্রী জোবেদা ও এক নাগিনীর সতীনসুলভ সম্পর্কের এক হাস্যকর চিত্র পাই। খোঁড়ার এই নাগিনীকে নাকের অলঙ্কার পড়ানো থেকে মাথায় সিঁদুর দেওয়া এবং তাকে 'বিবি' বলে ডাকা সবই একটি নারী-পুরুষের দাম্পত্য সুলভ আচরণ। খোড়ার কথাই পাই –

> "ওয়াকে নিকা করলাম জোবেদা আর তোর সতীন হল।"[৩]

অবশেষে কিছুটা অবাস্তব সম্মত হলেও দেখা যায় ঈর্ষাবশত বিবি জোবেদাকে দংশন করে, তার মৃত্যু হয়। কিন্তু খোড়া সাপটিকে না মেরে ছেড়ে দেয়, বরং বলে,

> "শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাব ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারতো না।"[৪]

গ্রামীণ নারীজাতির প্রবৃত্তির স্পষ্ট ইঙ্গিত গল্পে।

বীরভূমের লাভপুরের গ্রাম্য পরিবেশে বসবাস করার দরুণ তারাশঙ্কর লিখতে পেরেছিলেন এক নিম্নবর্গীয় বেদেনী সম্প্রদায়ের কথা। তারাশঙ্করের 'বেদেনী' এমনই এক সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার লড়াই-এর কাহিনী। দেখা যায় গ্রামবাংলায় সারকাস দেখানোর প্রবণতা বাজিকরের বাজি দেখিয়ে অর্থ উপার্জন এছাড়া বেদের মেয়ে বেদেনীর সাপ খেলা দেখিয়ে রোজগার।

শম্ভু স্ত্রী রাধিকাকে নিয়ে মেলা ঘুরে বাজি দেখায়, শম্ভুর কথায় যাকে বলে 'ভোজবাজি বা ছাড়কাছ'। কিন্তু সবশেষে দেখা যায় নতুন বাজিকরের আবির্ভাব ঘটলে রাধিকা সম্ভুকে ত্যাগ করে তার হাত ধরে। গল্পে লেখক গ্রাম্য নারী প্রবৃত্তির এক নিম্নরুচীর পরিচয় দিয়েছেন রাধিকার মাধ্যমে। প্রথম জীবনে তার শিবপ্রসাদের সঙ্গে বিয়ে হলেও পরে শম্ভুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এবং অবশেষে শম্ভুকে ত্যাগ করে নতুন বাজিকরের সাথে পালিয়ে যায় বৃদ্ধ শম্ভুকে পুড়ে মরবার জন্য ছেড়ে দিয়ে। এখানে নারীমনের এক ঘৃণ্য রূপ প্রদর্শন করেছেন লেখক তার এই গল্পে।

বাংলা সাহিতো পশুপ্রীতি বা গৃহপালিত পশু বাৎসল্যের কথা একাধিকবার বহু সাহিত্যিকের রচনায় আমরা পেয়েছি। তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' গল্পেও পশুর সঙ্গে সাধারণ মানুষগুলির অন্তরঙ্গ সম্পর্কের চিত্র আমরা খুঁজে পাই। লাভপুরের রুক্ষ-শুষ্ক লালমাটিতে দরিদ্র মানুষের চাষ আবাদ করে বেঁচে থাকার কৌশলও কম ছিল না। গল্পে রঙ্গলাল প্রধান চরিত্র, দৈনিক খেটে খাওয়া মানুষ। তার কথায় পাই সে তার ছেলেকে বলে,

> "বলি হ্যারে মুখ্যু, ভালো গোরু না হলে চাষ হয়। লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত করে, এক হেটো মাটি হবে গদগদে মোলাম ময়দার মতো। তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।"[৫]

তারপর দেখা যায় রঙলাল দুটো গোরু সুবিধে মতো না পেয়ে দুটো মহিষ কেনে এবং নাম রাখে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। কিন্তু বাঘের সঙ্গে সংগ্রামে কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে 'রঙ্গলাল বালকের মতো কাদিতে আড়ম্ভ করিল।'[৬]

রঙলালকে দেখা যায় কালাপাহাড়ের জোড় কিনে কুম্ভকর্ণের শূন্যতা পূরণ করতে চায়। কিন্তু তা হয় না। অবশেষে কালাপাহাড়ের মত্ততায় শেষপর্যন্ত তাকে হাটে বিক্রি করতে বাধ্য হয় রঙলাল। কিন্তু কালাপাহাড়ের চরিত্রে এক মনুষ্যচিত আচরণ ধরা পড়েছে। যা বাংলা সাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ। এভাবেই রাঢ়বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলোর সঙ্গে তাদের গৃহপালিত পশুরাও স্নেহের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত ছিল।

তারাশঙ্কর তার অধিকাংশ গল্পেই দেখিয়েছেন এক শ্রেণীর মানুষ কিভাবে দিনের পর দিন নিপীড়িত হচ্চে। উচ্চ জাত্যাভিমানযুক্ত কিছু মানুষ নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র মানুষগুলোর ওপর অত্যাচার করে চলেছে অবিরত তারই চিত্র রয়েছে তারাশঙ্করের 'ডাইনী' গল্পে। এই গল্পে বীরভূম বর্ধমান তথা রাঢ় অঞ্চল সংলগ্ন প্রান্তবর্গীয় মানুষগুলোর মধ্যে যে

অন্ধ, কু-সংস্কার বাসা বাঁধে এবং সেই সংস্কারের করাল গ্রাসে পরে সমাজের অবহেলিত ডোম, বাউরি, বাগদী প্রভৃতি সাধারণ জাতির মানুষের ওপড়।

কুসংস্কারের পাঁকে পড়ে নিজেকে ডাইনী মেনে নিতে হয়েছিল সুরধ্বনি নামে এক ১০-১১ বছরের অনাথ ডোম বালিকাকে। সমাজে উচ্চশ্রেণীর নিপীড়ণ সর্বদাই নিম্নশ্রেণীর অসহায় মানুষের ওপর, তাই গল্পে দেখা যায় হারু চৌধুরী সুরধ্বনিকে ডাইনি সম্বোধন করে অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে—

> "হারামজাদী ডাইনী, তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এত বড় বাড়? খুন করে ফেলব হারামজাদীকে।"[৭]

সমাজ এক বাপ মা হারা অনাথ বালিকাকে ডাইনি তকমা দিয়ে এক ঘরে করেছে। এবং অবশেষে সুরধ্বনি নিজেও ভাবতে বাধ্য হয়েছে যে সত্যিই বুঝি ডাইনী। তাই ভগবানের কাছে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার আর্তি জানিয়েছে। এভাবেই সে ৪০টি বছর কাটিয়ে দেয় ছাতিফাটার মাঠের নির্জন প্রান্তরে। এক যুবতী যখন ছেলেকোলে জল চাইতে আসে তখন তার মনে হয়-

> "খেয়ে ফেললাম। ... ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম।"[৮]

সুরধ্বনি ডাইনী নয়, কিন্তু তা প্রমাণ করার কোন রাস্তা নেই। অন্যান্য নারীর মতো তার মনেও স্নেহ ভালোবাসা রয়েছে, তা দেখা যায় যখন সাবিত্রী ছেলের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করে এবং তার ঘরের পাশে আসা যুবক-যুবতীর প্রেমে নিজের দাম্পত্য জীবনকে অনুভব করা এবং তাদের রূপোর বালা ও টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চাওয়ার মধ্যে সুস্থ-স্বাভাবিক মনের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু সমাজ তাকে সুস্থভাবে বাঁচতে দেয়নি। অবশেষে কালবৈশাখীর ঝড়ে তার জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি সত্যিই বেদনাদায়ক। সমাজের এই জাত-পাত, উচ্চ-নীচ, ধনি-দরিদ্র ভেদাভেদই তার এই গল্পের কাঠামো সঞ্চার করেছে।

তারাশঙ্কর তার গল্পে সমাজের উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাজন টা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক শ্রেণির মানুষ উপযুক্ত মাথা গোজার ঠাঁইটুকু পায় না, আর আরেক শ্রেণির মানুষ একের পর এক প্রাসাদ গড়ে তোলে, এমনই একটি গল্প 'ইমারাত'।

গল্পে আমরা শ্যামদাসবাবু, রামবাবু, হরিদাসবাবু ও মাধববাবুর মতো দোতলা-তিনতলায় বসবাসকারী মানুষ গুলোকে যেমন দেখি তেমনি তার পাশাপাশি সাধারণ রাজমিস্ত্রী জাবেদ শেখ ও তার আওতায় কাজ করা কামিন রসিদ, দাসী, রাণী, মতিবালা প্রমুখ দিনমুজুরি করে খাওয়া মানুষগুলোর সাথে পরিচিত হই। জনাবের জীবন আসে নানা পরিবর্তন আর তার প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নারী। জনাব তৈরি করেছে বড় বড় রাজপ্রাসাদ, মিনার, গির্জা, আরো কত কি, কিন্তু যার হাতে এই হাজার হাজার ইমারত তার মাথা গোজার ঠাই বড়ই জীর্ণ—

> "অদ্ভুত বাড়ি জনাবের, মাটির দেওয়ালের ভাঙা ঘর।"[৯]

কয়েকটি ছোট ছোট জাতি, বাউরি, ডোম, হাড়ি, সাওতাল সকলের সঙ্গে তার পরিচয়। অবশেষে সাওতাল পাড়ামুখ এক দুরারোগ্য রোগ নিয়ে ঢোকে সে গ্রামে কিন্তু তার সঙ্গিনী বাড়ি কোনটাই তার থাকে না। মাথা গোজার ঠাঁই জোটে বুড়ো বটতলায়। আব্দুলকে বলতে শুনি–

> "আমাকে ওই বটতলায় একটা ঘর চালাঘর বানায় দে। ওখানেই আমি থাকব।"[১০]

জনাবের তৈরি হাজার হাজার ইমারত রাজপ্রাসাদ এবং রাজপ্রাসাদে তৈরি পাখিদের কোটর এই দুর্গম বৃষ্টিতে কারোই কোন ক্ষতি হবে না জনাব ভরসা রাখে। কিন্তু তার আশ্রয় বুড়ো বটতলায় যার স্রষ্টা ঈশ্বর।

সমাজসচেতন লেখক সমাজের বিভিন্ন দিকটি তুলে ধরতে তিনি সিদ্ধহস্ত। সমাজের নিচুতলার মানুষের পারস্পরিক সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা গ্রামীণ দাম্পত্য জীবনে নানা টানাপোড়েন এবং স্ত্রীর স্বামীর প্রতি নিষ্কলুষ প্রেম এসবই রাঢ়বাংলার গ্রামীণ জীবনের অঙ্গ। তারাশঙ্করের 'না' গল্পে আমরা এমনই এক চিত্র পাই। যেখানে হতভাগ্য নিহত কালীনাথের মৃত্যুর ৮ বছর পরেও তার বিধবা স্ত্রী অশৌচ পালন করে চলেছে। কারণ তার স্বামীর হত্যাকারীর শাস্তি না হওয়া অবধি সে শান্তি পাবে না।

গল্পে পাই, ঘটনাচক্রে ঘটকের ভুলবশত অনন্ত ও কালীনাথ নামে দুই মামাতো ভাইয়ের পাত্র বদল হয়েছে। ফলে উচ্চশিক্ষিত কালিনাথের স্ত্রী হয় অল্প শিক্ষিত লক্ষীশ্রী ব্রজরাণী ও অন্যদিকে স্বল্প বিদ্যান অনন্তের স্ত্রী হিসেবে ঘরে নিয়ে এল উচ্চশিক্ষিত দাম্ভিক কন্যাকে। দেখা যায় ব্রজরাণী গভীর ভাবে পতিব্রতা সে অবৈধব্রত পালন করতে চায়। তার স্বামীর কথায়,

> "অবৈধ্যব্রত অর্থাৎ আমার আগে মরবার পাসকোর্টের ব্যবস্থা করছেন আর কি?"[১১]

অবশেষে দেখা যায় অনন্তের বন্দুকের গুলিতে কালীনাথ প্রাণ হারায়। স্ত্রী ব্রজরাণী স্বামীর অকাল মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থেকে যায়। কিন্তু বিচারের দিন আসতে বছর আটেক কেটে গেলেও ব্রজরাণী উদ্দিষ্ট দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। শুধুমাত্র হবিষান্ন ভোজন করে।

কিন্তু গল্পের মোড় ঘুরে যায় জেলে থাকা অনন্তের জীর্ণ-শীর্ণ ভেঙে পড়া চেহাড়ার মধ্যে কোথাও সেই বলিষ্ঠ দাম্ভিক পুরুষকে খুঁজে পায়নি ব্রজ। যে কারণে সরকারি উকিল যখন তাকে প্রশ্ন করে, অনন্তই তার স্বামীর খুনি কিনা? সে বলেছিল 'না'। গ্রামীণ সুলভ সহজ সরল আবেগের বশে ব্রজরাণি শেষপর্যন্ত স্বামীর হন্তারককে শাস্তি দেয়নি মুক্তি দিয়েছে। এই ক্ষমাই নিম্নবিত্ত নারীসমাজের এক মহান ক্ষমতা।

জন্ম মৃত্যু মানুষের জীবনে নিয়তির অমোঘ বিধান। কিন্তু মানুষ মৃত্যুকে মেনে নিতে চায় না। সে প্রাণপণে চেষ্টা করে মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে কিন্তু পারে না। তারাশঙ্করের 'পৌষলক্ষী' গল্পে এমনই এক চিত্র। গল্পে দেখি ১৩৫০ সালের পৌষ মাসের কথা রয়েছে মানুষ দীর্ঘ দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশটি বছর কাটিয়ে এসে, নানা রোগভোগে জীবন অতিবাহিত করছে। ম্যালেরিয়া শ্ল্যাষার মতো নানা রোগে ভুগছে মানুষ। বহু মানুষ গ্রাম থেকে পালিয়েছে। এমনকি সাওতালরা দুমকা শহরে পালিয়েছে। ৬০-৬৫ বছরের বৃদ্ধ মুকুন্দ পাল একদিন যে ছিল যুবক, দশাসই জোয়ান, আজ রোগের ভাড়ে জরাজীর্ণ। তথাপি নতুন ধান গজাবে মাঠ ভরে এই আশায় দিন গোণে কারণ—

> "ওই ধানই জীবনকাঠি, মরণকাঠি, জবারে ধান ঘরে উঠলে জীবন থাকবে নইলে মরণ। তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"[১২]

অবশেষে দীর্ঘ দুঃসময়ের পর গ্রামের রোগগ্রস্থ দূর্বল মানুষগুলি মাঠ ভরা সোনালী ধান দেখতে পেয়েছে। পাল বৃদ্ধ রোগ ভোগে দুর্বল হলেও পরিবার চালানোর তাগিদে মাঠে নামে ধান কাটতে। ধান কেটে গোলায় ভড়লেই হবে পূর্বদিনের মতো পৌষলক্ষী উৎসব, হবে নানান ভাসান গান, মনসার পালা গান। পাল পূর্বে জোয়ান ছিল এসব পালায় চন্দ্রচূড় কিংবা গোদা সাজতো আজ তার সে সামর্থ নেই। কিন্তু পৌষলক্ষীর উৎসবের স্বপ্ন তার বুকে -

> "খামারে সব গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা দুধালো গাই, কেঁড়ে ভাত, দুধ, জ্বালায় জ্বালায় গুড়, পুকুর ভরা মাছ, পৌষলক্ষীতে সে কত সমারোহ।"[১৩]

কিন্তু সেসব দিন আর নেই চালের দাম ত্রিশ টাকা মন, পালকে বেচে দিতে হয় তার অংশে জমি। এতবছর পর যখন মাঠে ধান এল পাল তা সংগ্রহ করবার জন্য নেশা পর্যন্ত করে কারণ অনেক দায় তার —

> "সরস্বতীর কাপড় ছিঁড়েছে লক্ষীও কাপড় নাই, নিজেরও চাই...।"[১৪]

অবশেষে ধান চেপেছে গোরুর গাড়িতে। মা লক্ষী ঘরে উঠবেন গোরু দুটোকে মনে সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে চলে পাল কিন্তু ধানের গাড়ি গোলা অব্দি পৌঁছালেও পাল পৌঁছতে পারে না। মৃত্যু তাকে গ্রাস করে। হাতের মুঠায় ধান নিয়েই তাকে সব মায়া ত্যাগ করতে হয়।

রাঢ়বঙ্গের প্রাপ্ত জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামগুলিতে ছিল তারাশঙ্করের বিচরণ। সেখানকার প্রান্তিক বিভিন্ন জনজাতির মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী এবং প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে নানা নিম্নরুচির ঘৃণ্য জীবিকা অর্জন করা সবই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন লেখক। তাদের মধ্যে বাগদী নামক এক জাতির আমরা পরিচয় পাই - 'আখরাইয়ের দীঘি' গল্পে। তার 'হাসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসেও এই বাগদী জনজাতির পরিচয় পাই। আখরাইয়ের দিঘি গল্পে জীবনের এক হিংস্র ভয়ঙ্কর রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। যেখানে এক জাতি আদিম হিংস্র প্রবৃত্তির তাড়নায় জ্যান্ত মানুষ খুন করেও সংসার চালানোর খোরাক জোগায়। কালী বাগদী এক দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল, বহু বছর ধরে চলে আসা পূর্বপুরুষদের এ পেশা ধরে রেখেছে

বাগদীরা। ছোট জাত, মদই তাদের আমোদ-আহ্লাদের প্রধান উপকরণ। এক সময় এরা নবাবের পল্টনে কাজ করতো। কোম্পানির আমলে তাদের পল্টানের কাজ চলে যাওয়ায় তাদের এই ঘৃণ্য ব্যবসার সূত্রপাত। কালীচরণের কথায় শুনি -

> "হুজুর চাষ আমাদের ঘেন্নার কাজ, মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়, মাটি হল মেয়ের জাত।"[১৫]

তাই বাগদী পুরুষেরা খুন করে আর মেয়েরা লাশ গায়েব করে। অন্ধকার রাত্রিতে পথচারী পথিককে মেরে সর্বপ্রান্ত করে আখরাইয়ের দীঘিতে পুতে রাখে।

কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস দেখা যায় গল্প অন্তে। বাদলার রাতে কালীবাগদীর হাতেই খুন হয় তার একমাত্র ছেলে তারাচরণ। তারাচরণ বাবা বাবা করে চিৎকার করলেও কালী তার পুত্রের গলার স্বর চিনতে পারে না। মদের নেশায় আচ্ছন্ন কালীবাগদী পুত্রের লাশ আখরাইয়ের দিঘিতে পুতে রাখে। এ যেন বিচারকের বিচার নয় ঈশ্বরের বিচার। কর্ম ও কর্মফলের আশ্চর্যরকম দৃষ্টান্ত আমরা এ গল্পে পাই। শেষে কালী নিদারুণ যন্ত্রণা ও পুত্রশোক ও শেষমেষ মৃত্যু গল্পে এক অন্যরকম অনুভূতির সৃষ্টি করেছে।

বীরভূমের বিভিন্ন অখ্যাতনামা জনজাতি কাহার, বাগদী, ডোম, জেলে প্রভৃতির পাশাপাশি উঠে এসেছে বীরভূমের সিথল গ্রামে বসবাসকারী এক বাজিকর বা যাদুকর সম্প্রদায়ের কথা। তারাশঙ্কর 'যাদুকরী' গল্পে আমরা তারই পরিচয় পাই। এদের বেশ-ভূষা, আদব কায়দা, ভিন্ন ভাষা সকলের চেয়ে পৃথক, সামান্য বাজি দেখিয়ে কিংবা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে এরা এদের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করে। পুরুষেরা এখানে নীরিহ শান্ত। এদের অদ্ভূত বেশভুষা—

> "গলায় তুলসীর মালা পরনে মোটা তাঁতের কাপড়, দুই কাঁধে দুইটা ঝোলা ও ঢোলক, মুখে এক অদ্ভুদ টানের মিষ্ট ভাষা। এই ভাষা হইতেই লোকে চিনিয়া লয়। ইহারা বাজীকর।"[১৬]

নারীদের বেশ পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এরা বাজির ঝোলা ও ভিক্ষার পাত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে গ্রাম। থেকে গ্রামান্তরে। যাযাবরদের সাথে তাদের একটিই পার্থক্য তাদের ঘর থাকে যাযাবরদের থাকে না। গল্পে এক বাজিকরনির পরিচয় পাই যে বাজি দেখিয়ে কিংবা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনধারণ করে। এমনকি কখনো এলাচ দিয়ে মন্ত্র পড়ে স্বামী বশিকরণের উপায়ও বলে দেয়। কখনো উশৃঙ্খল নৃত্যগীত করতে হয় মাত্রা ১ টাকা রোজগারের জন্য।

গ্রামীণ দরিদ্র এই অসহায় অবহেলিত মানুষগুলির কোন সংকোচ নেই, নেই কোন বাধা বিপত্তি, নেই লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা একমাত্র নিয়তিই এদের অমোঘ বিধান। গল্পে এই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষগুলোর অসাধারণ মানবিকতার পরিচয়ও পাই। দেখা যায় বাজীকর মেয়েটি রমাকে নিজ সংসারে ফিরিয়ে দেয়, শশী ডোমকে রক্ষা করে। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ এদের পেশা বেঁধে দেয়। সমাজ থেকে বিচ্যুত অবহেলিত জাতিগুলি চিরকাল এমনিভাবে দিন কাটায়। যাদের নিজের বলতে কিছুই নেই।

'দেবতার ব্যাধি' গল্পে তারাশঙ্কর রাঢ় দেশের অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের ভিন্নরূপ তুলে ধরেছেন। গড়গড়ি নামক এক ডাক্তারের মাধ্যমে। রাঢ় অঞ্চলে পল্লী গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে নানা অসহায় দরিদ্র মানুষেরা যারা কোনক্রমে একটা ক্ষুদ্র পেশা অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করছে। গল্পের শুরুতেই পাই—

> "রাঢ়দেশের পল্লীগ্রাম-গণ্ডগ্রাম অবশ্য বলা চলে, সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে, ছোট বাজারও বসে, মিষ্টির দোকান, নটকানের দোকান, কাপড়ের দোকান, মনিহাড়ির দোকান, কাপড়ের দোকান না থাকলেও বৈরাগীর খোঁড়া ও বিশু মিয়া দু'জনের দুটো সেলাইয়ের কল চলে।"[১৭]

কিন্তু গ্রামে দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ভরসা ছিল গ্রামের মন্দিরের কালিমাতা কিংবা অন্যকোন দেবদেবীর ওপর। ডাক্তার গড়গড়ি এই পল্লীগ্রমস্থ মানুষগুলোর কাছে ঈশ্বরের মতো আবির্ভাব হয়ে সেবা কাজে হাত লাগায়। সামান্য কিছু ফি নিলেও দুঃখি দরিদ্র আর্তের জন্য তার ফ্রি চিকিৎসা এমনকি পথ্যের জোগারও করে দেয়, ফলত গ্রামীণ মানুষগুলোর নিস্কলুষ সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করে। কিন্তু এটাই তার কাছে মহাবিপদের ইঙ্গিত। তাই সে নিজ গ্রামে ফিরে যায়। এবং সঙ্গী হেডমাস্টারকে নিজের জীবনবৃত্তান্ত লিখে যায়।

গড়গড়ি নিজ গ্রামেও এমন সেবার কাজে দিন-রাত লেগে থাকতেন। কিন্তু মানুষের মনের অতল গভীরে চোরা কুঠুরিতে লুকিয়ে থাকে এক রহস্য' তা হল ঘৃণ্য প্রবৃত্তির রহস্য, যে মানুষগুলোকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলে তাদের বউ মেয়ের প্রতি তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে অসহায় সেই নারীরা কৃতজ্ঞতার পুরস্কার হিসেবে দেবতার অর্ঘের মতো নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এভাবেই তারাশঙ্কর প্রবৃত্তি তাড়িত মানবমন ও তার ফলে অসহায় মানুষের জীবন যন্ত্রণা এক সুস্পষ্ট রূপ তুলে ধরেছেন ড. গ্রেগরীর মাধ্যমে।

তারাশঙ্কর মূলত সমাজের ব্রাত্যজনের কথাকার। সমাজের নিম্নশ্রেণীর হৃতদরিদ্র মানুগুলিই তার গল্পের মাশমশলা সঞ্চয় করেছে। ‘মতিলাল’ এমনই এক গল্প যেখানে মতিলালের মতো সাধারণ অসহায় মানুষের সমাজে কোন স্থান নেই। গল্পে মতিলাল ও ভুবনমোহিনী স্বামী-স্ত্রী। দুজনেই কুৎসিৎ কুরূপা। মতিলাল সঙ সেজে গাজনের উৎসবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেয়। পরিবর্তে পুজোর নৈবেদ্য ছাড়া কিছুই জোটে না। ভুবন সংসারে অন্নের সংস্থান করে এবং স্বামীকে দুটি গোরু কিনে আয়ের পথ খোলার পরামর্শও দেয়।

জাতিতে হাড়ি মতিলাল চতুর্থ বিয়ে করে পৈতৃক ভিটেতে বাস করে। সমাজে তাদের স্থান সর্বনিম্ন। কিন্তু তাদের এই ক্ষুদ্র দাম্পত্য জীবন সন্তানের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তাই মতিলাল মন্ত্র পড়া মাদুলী এনে পড়ায় ভুবনকে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নানা পূজা-পার্বণ উৎসবের প্রাধান্য দেখা যায়। সেইসব আকড়ে ধরেই এইসব অসহায় দরিদ্র মানুষগুলি বেঁচে আছে। গল্পে রাঢ় দেশের চিত্র —

> “রাঢ় দেশ বৈশাখ মাসে বুদ্ধ-পূর্ণিমায় ধর্মরাজের পূজা নিম্নজাতির এক বিরাট উৎসব।”[১৮]

গ্রামের নিম্নশ্রেণীর নর-নারীরা সঙ সেজে রাস্তায় বেরিয়ে নানা নৃত্যগীত করে। মতিলালও ঝাটাবুড়ি সেজে দু'টাকা বকশিস পায় কিন্তু পরে প্রেসিডেন্ট বাবুর চাপরাশি তাকে প্রচণ্ড প্রহার করে এবং গ্রামে ঢুকতে বারণ করে, কারণ তাকে দেখলে ছোট ছেলেরা ভয় পাবে।

মতিলাল গভীরভাবে পীড়িত হয় এবং ভোবনের মাদুলি ছিড়ে ফেলে কারণ তার ছেলে যদি তাদের মতো কুৎসিৎ হয় তাবে সমাজে তার কোন ঠাঁই হবে না। কারণ সে বুঝেছে একে কুৎসিৎ তার ওপর নিদারুণ দারিদ্রতা নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না, সমাজে। তাই সে নিঃসন্তান থাকাই শ্রেয় বলে মনে করেছে।

‘সন্তান’ তারাশঙ্করের আরোও একটি গল্প যেখানে মতিলাল গল্পের মতিলালের মতো গোবিন্দও ছিল কুৎসিত ও কদাকার। কিন্তু মতিলাল বুঝে গিয়েছিল এ সংসারে তাদের সন্তান না আসাই ভালো, কিন্তু গোবিন্দ তা বোঝেনি। ছোটজাতের গোবিন্দ কাজ করত জমিদার বাবুর বাসায়। জমিদার বাবুর ফুটফুটে সুন্দর ছেলের প্রতি ছিল তার গভীর স্নেহ ভালোবাসা। কিন্তু ছোটজাতের গোবিন্দের আচরণ জমিদারকে ক্রোধান্বিত করে সে গোবিন্দকে কাজ থেকে বিতাড়িত করে। গোবিন্দর মনে জেদ চেপে বসে এবং সে ঘটক নরহরির সাহায্যে বিবাহ করে মঞ্জুরীকে। মঞ্জুরী বৈষ্ণবের মেয়ে তাই তাকে ধর্মান্তরিতও করতে হয়, বিবাহের জন্য। অবশেষে সেই দিন আসে। মঞ্জুরী শিশু পুত্র জন্ম দিলে গোবিন্দ তাকে দেখতে মহানন্দে তার শ্বশুর বাড়ি যায়। কিন্তু কুৎসিত, বিকলাঙ্গ শিশু দেখে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সে তো এমন শিশু চায়নি। সে চেয়েছিল জমিদারের সন্তান মাণিকের মতো। ফলে গোবিন্দ দিশেহারা হয়ে তার শিশুকে আতুরঘরেই হত্যা করে।

গোবিন্দ নিজেও বিকলাঙ্গ কুৎসিত জন্ম থেকেই সে কারণে সমাজের কাছে সে অবহেলিত লাঞ্ছিত। সে চায়নি সে লাঞ্ছনা তার সন্তান পাক। শেষে তাকে পাগলা গারদে রাখা হয় এক চিকিৎসকের পরামর্শে সুন্দর শিশুদের চিত্র দেখানো হয় দেওয়ালে। একে কুৎসিত, সহায় সম্বলহীন দরিদ্র নিম্নবর্গীয় মানুষগুলোর জীবনের কোন মূল্য থাকে না।

রাঢ় বাংলার নিম্নবিত্ত আদিম প্রবৃত্তি তাড়িত অসংস্কৃত মানুষগুলির আরও একটি প্রবৃত্তি হল চৌর্যবৃত্তি। আর তারই পরিচয় আমরা ‘ব্যাধি’ গল্পের হারান আচার্যের মধ্যে দিয়ে পাই। মন্দিরের বিগ্রহের নানা অলংকার চুরি করে সে ধীরে ধীরে অনেক ধনী হয়। তার মতে কাঠ বা পাথরের মূর্তিতে অলঙ্কার পড়ানো অনুচিত। গল্পে শ্যাম ঘোষালের মন্দিরে ঢুকে মন্দিরের সোনার পৈতের প্রতি প্রলোভন এমনকি স্বল্প সোনা পাওয়ায় তা মন্দিরের পুষ্প ঘরের মধ্যে পুতে রেখে আসেন। ঘোষাল মশায় পায়ে পরেও গয়না ফেরত পাননি। স্বর্ণকার নিশি থেকে বোন হৈম সকলেই এই ঘৃণ্য

কাজ থেকে দূরে থাকতে বলে কিন্তু সে পারেনি। অবশেষে পুলিশের ভয়ে ও বোনও ভাগ্নের থাকা খাওয়ার যোগান দেওয়া ভয়ে কাশী যাত্রার নাম করে ছদ্মনামে মুর্শিদাবাদের মনোহর বাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মনোহরবাবু এককালে জমিদার থাকলেও আজ তার ১০ হাজার টাকার রাজস্ব বাকি। মনোহর বাবুকে সাহায্য করার কথা বলেও হারান কাশি চলে যায়।

অবশেষে বর্ধমান হাসপাতালে যখন মৃত্যুর সঙ্গে হরানবাবু লড়াই করছেন তখন মনোহরবাবুকে বলেছেন—

> "উদ্ধার করুণ বাবু। আমায় উদ্ধার করুণ। ওগুলো যেন বুকে চেপে বসে আছে আমার, প্রাণ আমার বেরুচ্ছে না।"[১৯]

মনোহর বাবু কিংবা তার ভাগ্নে তমোরীশকে তার গচ্ছিত ধনের কথা বলে যাবে ভেবেও শেষপর্যন্ত বলেননি। কারণ মৃত্যুর কোলেও সে তার অর্থের মায়া ত্যাগ করতে পারেননি। কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে।' তার প্রতিটি ধনের মধ্যে রয়েছে মানুষের কান্না যে কোন সৎ কাজে তার অর্থ ব্যবহার করতে প্রারেননি। এমনকি নিজেও ভোগ করতে পারেনি।

তারাশঙ্কর তার গল্পে নিম্নবর্গীয় নারীজাতির অন্তরের বিচিত্র রহস্য উৎঘাটন করেছেন। নারীমন না রহস্যে ভড়া। তার গল্পে নারীকে যেমন উগ্র যৌবন লিপ্সা তাড়িত হয়ে ঘরছাড়া হতে দেখা যায়, আবার দেখা যায় ঘর বাঁধবার জন্য নানান ত্যাগ স্বীকার করতেও। রাঢ় বাংলার রুক্ষ পরিবেশে বসবাসকারী এই নিম্নবৃত্তের মানুষগুলি সত্যিই স্বভাব রুক্ষ। তবে তা সত্ত্বেও প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে সুন্দর মনের পরিচয় তারাশঙ্কর পেয়েছেন। তেমনি একটি গল্প 'মানুষের মন'। সুভাষিণী ও ভবানন্দের দ্বন্দ্বমুখর দাম্পত্য জীবনকে আমরা দেখি গল্পের শুরুতেই। ধনী বাবার কন্যা সুভাষিণী মাত্র ১১ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় শিক্ষিত চিন্তাশীল ভবানন্দের সাথে। কিন্তু তারপরই অভাবের নির্মম কামড় যা নিম্নবিত্ত মানুষের সংসারে শান্তি নষ্ট করার জন্য যথোপযুক্ত। উপার্জনহীন স্বামী, উপরন্তু মাতৃত্বহীনা সুভাষিণী এই দুয়ের যন্ত্রণা কুড়ে খায় তাকে। বাবার অনুগ্রহে বাঁচতে চায় না সে, স্বামী সামান্য উপার্জন করলে তাতেই সংসার চালাতে চায় সে।

অবশেষে একদিন স্বামী নিরুদ্দেশ হয়। চড়কায় সুতো কেটে জীবিকা নির্বাহ করে সুভাষিণী। অপরদিকে দেখা যায় ভবানন্দ বহুদিন নিরুদ্দেশ থাকার পর ফিরে আসে মদ্যপ ও ধনী হয়ে। যে স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় সে দিন গুনছিল এবং বাবার অর্থের পরোয়া না করে নিজের কুটিরে দিন-যাপন করছিল, সেই স্বামীর এমন রূপের কথা মেনে নিতে পারেনি। ভবেন্দ্রর মধ্যে ছিল পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার প্রয়াস, সেই ভবেন ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়ে ধনবান হয়ে নিজের আদর্শকে জলাঞ্জলী দিয়েছে। সুতরাং এমন স্বামী চায়নি সুভা, চেয়েছিল সৎ ভাবে উপার্জন করে তার স্বামী তাকে সুন্দর জীবন দান করুক। কিন্তু তা হয়নি বলেই সুভাষিণী তার নীতি বিসর্জন না দিয়ে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তাদের গোছানো সংসার, নারী মনে স্বামীর প্রতি অপার ভক্তি শ্রদ্ধা, স্বামী সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা, এসব চিত্র রাঢ় বাংলার সংসার জীবনে দুর্লভ নয়। কিন্তু কখনো অসহায় দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণীর দুঃখি পরিবারে দেখি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয় নানা বিচিত্র কারণে।

'পদ্মবউ' তারাশঙ্করের এমন একটি গল্প যেখানে চন্দ্র মশাই ও তার বউ-এর স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন, ছাত্র পড়িয়ে কোনভাবে সংসার জীবন অতিবাহিত করেন তারা। কিন্তু এরই মধ্যে দুরারোগ্য কৃষ্ঠ ব্যধিতে আক্রান্ত হয় চন্দ্র মশাই। বিকৃত চেহারায় কোনক্রমে ছাত্র পড়িয়ে চলে তার জীবন। প্রথম যখন রোগটি ধরা পরে তখন পদ্মবউ ভয়ে বাপের বাড়ি পালিয়ে যায়। কিন্তু পদ্মর বাবা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি মহাভারতের কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থ স্বামীকে নিয়ে সতীর বেশ্যাগৃহে যাত্রার কথা বলে স্বামী সেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য কন্যাকে উৎসাহ দিলে সে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামী সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীকে যত্ন করে। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত স্বামীর পচনশীল দেহে স্পর্শ না করতে দিলে যে বিরক্ত হয়, সে বিশ্বাস করে না এ রোগ ছোঁয়াচে।

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's*
*Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-16*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 132-141*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

ক্রমে সব পরিবর্তন হল এক ডাক্তারের কথায় কুষ্ঠরোগীর কাছে ছেলেদের পড়তে আসা বন্ধ হল। দরিদ্র সংসারে অভাব অনটন দূর করতে পদ্মকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান ভাঙা ও চাল কুটার কাজ করতে হয়। যে দেবতার প্রতি অটুট বিশ্বাস কিন্তু সেই বিশ্বাসও তার টলে যায়। এক দুরারোগ্য ব্যাধি তাকেও আক্রমণ করে। সে মেনে নেয় স্বামীর রোগ তারও হয় তাই ঘরে থাকা দেব-দেবীর ছবিতে আঘাত করে, স্বামীর সঙ্গে রুষ্ট আচরণ করে, শেষপর্যন্ত প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু সে মৃত্যুর পর জানা যায় তার নিউট্রিশনের অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়েছিল। আর এভাবেই এই সমাজের নিম্নস্তরে বসবাসকারী অখ্যাত মানুষগুলোর জীবনের অবসান ঘটে।

মূলত রাঢ়ের কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্লোলীয় যুগে তার আবির্ভাব কিন্তু কল্লোলীয় পরিবর্তনশীল রচনাধারার থেকে তার রচনা পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। রাঢ়ভূমির লেখক রাঢ়ের পরিচিত গ্রামবাংলার সহজ স্বাভাবিক চিত্র তার রচনায় ফুটে উঠেছে। সেখানকার আঞ্চলিকতা মানুষের ভাষা, আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদ, সমাকিজ রীতি-নীতি, চাওয়া-না চাওয়া নানা আদিম প্রবৃত্তি যা তাদের জীবনকে প্রতিমুহূর্তে প্রভাবিত করছে, তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাসে তা সবকিছুই পটভূমি রূপে অঙ্কিত হয়েছে।

লোকায়ত জীবনের কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম ও বর্ধমান জেলার প্রান্তবর্তী গ্রাম্য অঞ্চলে বসবাসকারী ব্রাত্যশ্রেণীর জীবনদর্পণ তার ছোটগল্পগুলি। রাঢ়ভূমিরূপ ব্রাত্য সাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে তার আত্মার যোগ। সারা জীবন তাদের সঙ্গে মিশেছেন। তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছেন স্বচক্ষে। মূলত বীরভূমের গ্রামাঞ্চলকে ভালোবেসেছিলেন বলেই তিনি তাদের কথা লিখতে পেরেছিলেন।

তাঁর গল্পে আমরা দেখি কিভাবে ধীরে ধীরে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন হচ্ছে কিভাবে কৃষি সভ্যতাকে গ্রাস করছে যন্ত্রসভ্যতা। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সমাজে ভাঙন ঘটতে শুরু হয়। গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমশ ভেঙে পড়ে। উচ্চনিচ ভেদাভেদ সমাজ কাঠামোকে ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করে, মানুষ নানা নিম্নবৃত্তি ও কু-প্রবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সমাজে যারা দরিদ্র বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত সেইসব অসহায় মানুষগুলো লেখকের চোখ এড়িয়ে যায়নি। যাদের সমাজ কোন মূল্য নেই, যাদের কথা কেউ ভাবে না, তারাই তার গল্পের চরিত্র। নানা নিম্ন শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তিধারি মানুষ বেদে, ডোম, বাগদী, যাযাবর, বেদেনী, মাঝি প্রভৃতি মানুষগুলো তার ছোটগল্পগুলির কাহিনী বিন্যাস করেছে।

রুক্ষ কাকুড়ে লাল মাটির দেশ রাঢ়। চারিদিক জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশ কখনো কাঠ ফাটা রৌদ্র একফোটা জলের তৃষ্ণা মানুষের বুকে আবার কখনো বাণ বন্যার মতো দুর্যোগের কারণে মানুষগুলোর জীবন ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে কখনো বেঁচে থাকার জন্য গ্রহণ করতে হয়েছে সাপ খেলা, কিংবা বাজি দেখানোর মতো ভয়ঙ্কর পেশা, আবার গ্রামীণ নর-নারীর সুন্দর প্রেমবহুল দাম্পত্য জীবনের কথাই বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, দেখিয়েছেন নর-নারীর সম্পর্কের এক কদর্য গ্রামীণ রূপ। কখনো এক নারী বহু পুরুষে আসক্ত আবার কখনো এক পুরুষ বহু বিবাহেলিপ্ত। দেখা গেছে নারী পুরুষের সম্পর্কে সন্তান কামনা এবং পাশাপাশি কদর্য করুপ সন্তান দরিদ্র ঘরে জন্ম দেওয়ার আশঙ্কায় নিঃসন্তান থাকার পরিকল্পনা, কারণ সবটাই সমাজ।

বীরভূমের লাভপুর গ্রামে জন্মেছিলেন তিনি আমরা তার বহুগল্পে লাভপুরের গ্রাম্যজীবনের প্রান্তিক মানুষের ছবি পাই এবং তিনি কর্মসূত্রে কিংবা সমাজ সেবার তাগিদে রাঢ়ের বহু অঞ্চলে ঘুরেছেন বলেই সেইসব মানুষগুলোর বাস্তব চিত্র তার সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। আজ রাঢ়ের অন্ত্যজ শ্রেণির জনজীবন ও তাদের বহুবিধ কার্যকলাপ, মানবমনের বিচিত্র প্রকাশ আমরা খুব সহজেই তারাশঙ্করের গল্পগুলি থেকে অনুধাবন করতে পারি। সেকারণেই তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণির ছোটগল্পকার।

## Reference :

১. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত): 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা:) লিমিটেড, ১৪. বি. বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৯

২. তদেব, পৃ. ৪০

৩. তদেব, পৃ. ৬২
৪. তদেব, পৃ. ৬৪
৫. তদেব, পৃ. ৬৪
৬. তদেব, পৃ. ৭০
৭. তদেব, পৃ. ১০৫
৮. তদেব, পৃ. ১০৮
৯. তদেব, পৃ. ১৭০
১০. তদেব, পৃ. ১৭৯
১১. তদেব, পৃ. ১২৪
১২. তদেব, পৃ. ১৩০
১৩. তদেব, পৃ. ১৪২
১৪. তদেব, পৃ. ১৪৭
১৫. তদেব, পৃ. ৫৭
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তারাশঙ্কর : যাদুকরী', ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি: ৮ সি. রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২
১৭. ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত) : 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা:) লিমিটেড ১৪. বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১৪৯
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তারাশঙ্কর : গল্প পঞ্চাশৎ', মুকুন্দ পাবলিশার্স, ৮৮ বিধান সরণি, কলিকাতা- ৪, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৮৮
১৯. তদেব, পৃ. ৪৮৫